بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৩০। www.motaher21.net

فَأَنذِرْ

" সাবধান "

" Warning !"

সুরা: আল-মুদ্দাস্সির

আয়াত নং :-1

يَٰٓأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী,

নামকরণ : الْمُدَّثِّرُ অর্থ :

বস্ত্রাবৃত, বস্ত্রাচ্ছাদিত। এর দ্বারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। অত্র সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত الْمُدَّثِّرُ শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছ।

শানে নুযূল :

ইয়াহইয়া বিন আবী কাসীর (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি আবূ সালামাহ বিন আব্দুর রহমানকে কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে বলেন :

(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ)

এ আয়াতটি। ইয়াহইয়া বলছেন : মানুষ বলে-

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)

এ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। আবূ সালামাহ বললেন : এ সর্ম্পকে আমি জাবের (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি এবং তাকে সেরূপ বলতে শুনেছি তুমি যেরূপ আমাকে বলেছ। জাবের (রাঃ) বলছেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা আমাকে বলেছেন তোমাকে তাই বলব। তিনি বলেছেন : আমি হেরা পর্বতের গুহায় আমার প্রভুর ইবাদতে মগ্ন ছিলাম। সেখান থেকে অবতরণ করে আমি শুনতে পেলাম, কে যেন আমাকে ডাকছে। আমি আমার সামনে-পেছনে, ডানে এবং বামে তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি তখন মাথা উপরের দিকে তুললে কিছু দেখতে পেলাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম যে হেরা গুহায় আগমন করেছিল। সে একটি চেয়ারে বসে আছে। (সহীহ বুখারী : ৪৯২৫) আমি খাদিজা (রাঃ)-এর কাছে চলে আসি। (পূর্বের বর্ণনায় রয়েছে আমি ভয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ি) খাদিজা (রাঃ)-কে বলি : আমাকে চাদরাবৃত কর এবং ঠাণ্ডা পানি ঢালতে থাকো। খাদিজা (রাঃ) তা-ই করলেন। তখন

(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ)

আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী : ৪৯২৪)

শানে নুযূল থেকে বুঝা গেল এ আয়াতগুলো প্রথম অবতীর্ণ নয়। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন : সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম যে হেরা গুহায় এসেছিল। অর্থাৎ ইতোপূর্বে জিবরীল (আঃ) ওয়াহী নিয়ে হেরা গুহায় এসেছিলেন। মূলত এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কিছু দিন (ওয়াহী আসা বন্ধ থাকার) পর। তাই প্রথম অবতীর্ণ সূরা বলা হয়েছে। (মাবাহিস ফী উলূমুল কুরআন)

সূরাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দাওয়াতী মিশনে অনুপ্রেরণা ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য দাওয়াতী কাজে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজের আমল সংশোধন করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাদীসে এসেছে, সর্ব প্রথম হেরা গিরি গুহায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফেরেশতা জিবরাইল আগমন করে ইকরা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার নিকট গমন করলেন এবং তার কাছে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে "ফ্যাতরাতুল ওহী" বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন, একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এক জায়গায় একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হল। [বুখারী: ৪, মুসলিম: ১৬১]

ওপরে ভূমিকায় আমরা এসব আয়াত নাযিলের যে পটভূমি বর্ণনা করেছি সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথাটি ভালভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ ইয়া আয়্যুহাল রাসূল বা يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ (ইয়া আয়্যুহান্নাবীয়ু) বলে সম্বোধন করার পরিবর্তে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (ইয়া আয়্যুহাল মুদ্দাস্সির) বলে সম্বোধন কেন করা হয়েছে। নবী (সা.) যেহেতু হঠাৎ জিবরাঈলকে আসমান ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি আসনে উপবিষ্ট দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং সে অবস্থায় বাড়ীতে পৌঁছে বাড়ীর লোকদের বলেছিলেনঃ আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো, আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। তাই আল্লাহ তাঁকে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন করেছেন। সম্বোধনের এ সূক্ষ্ম ভংগী থেকে আপনা আপনি এ অর্থ পরিস্ফূটিত হয়ে ওঠে যে, হে আমার প্রিয় বান্দা, তুমি চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছো কেন? তোমার ওপরে তো একটি মহৎ কাজের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উঠে দাঁড়াতে হবে।

সুরা: আল-মুদ্দাস্সির

আয়াত নং :-2

قُمْ فَأَنْذِرْ

ওঠো এবং সাবধান করে দাও,২

তাফসীর :

টিকা:২) হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় যে আদেশ দেয়া হয়েছিল এটাও সে ধরনের আদেশ। হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছিলঃ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "তোমার নিজের কওমের লোকদের ওপর এক ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব আসার পূর্বেই তাদের সাবধান করে দাও।" (নূহ, ১) আয়াতটির অর্থ হলো, হে বস্ত্র আচ্ছাদিত হয়ে শয়নকারী, তুমি ওঠো। তোমার চারপাশে আল্লাহর যেসব বান্দারা অবচেতন পড়ে আছে তাদের জাগিয়ে তোল। যদি এ অবস্থায়ই তারা থাকে তাহলে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির সম্মুখীন তারা হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দাও।

সূরার প্রথম সাতটি আয়াত আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে মানব জাতিকে সতর্ক, পার্থিব জীবনের যাবতীয় দুর্দশা, দুষ্কর্ম ও শিরকের পংকিলতা থেকে রক্ষা করে আখিরাতের আযাব থেকে নাজাতের দিকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সতর্ক করার কাজটি রিসালাতের প্রধান কাজ, যুগে যুগে প্রত্যেক রাসূল এ অমিয়বাণী নিয়েই স্বজাতির কাছে আগমন করেছিলেন। এখন যেহেতু নাবী আসবে না তাই এ মহৎ দায়িত্বটি উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওপর আরোপিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রত্যেক অনুসারীদের ওপর তা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

((قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ))

"বল : 'এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে ও দলীল-প্রমাণের সাথে আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (সূরা ইউসুফ ১২ : ১০৮)

তবে মানুষ গোমরাহ হলে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি বা মানুষ সুপথ পেলে আল্লাহ তা'আলার কোন উপকার হবে এমন নয় বরং মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া যে, তিনি চান না কোন বান্দাকে জাহান্নামে দিতে। তিনি চান প্রত্যেক বান্দাই জান্নাতে যাক। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا)

“তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আন তবে তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করেন? আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা নিসা ৪ : ১৪৭) কিন্তু মানুষ তাদের কর্মের মাধ্যমে নিজেদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়।

(قُمْ فَأَنْذِرْ) অর্থাৎ তুমি ওঠো, শুয়ে থেকো না। মানুষকে আখিরাতের শাস্তির ভয় দেখাও। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)

“আর তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের ভীতি প্রদর্শন কর” (সূরা শুআরা ২৬ : ২১৪)। প্রথম ওয়াহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নাবীরূপে মনোনীত করা হয়েছে, আর এ ওয়াহী দ্বারা তাঁকে রাসূল বানানো হয়েছে। (ইবনু কাসীর)

সুরা: আল-মুদ্দাস্সির

আয়াত নং :-3

وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ

তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো,৩

তাফসীর :

টিকা:৩) এ পৃথিবীতে এটা একজন নবীর সর্বপ্রথম কাজ। এখানে এ কাজটিই তাঁকে আঞ্জাম দিতে হয়। তাঁর প্রথম কাজই হলো, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ পৃথিবীতে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ মেনে চলছে তাদের সবাইকে অস্বীকার করবে এবং গোটা পৃথিবীর সামনে উচ্চ কণ্ঠে একথা ঘোষণা করবে যে, এ বিশ্ব-জাহানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ নেই। আর এ কারণেই ইসলামে “আল্লাহু আকবার” (আল্লাহই শ্রেষ্ঠ) কথাটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। “আল্লাহু আকবার” ঘোষণার মাধ্যমেই আযান শুরু হয়। আল্লাহু আকবার একথাটি বলে মানুষ নামায শুরু করে এবং বার বার আল্লাহু আকবার বলে ওঠে ও বসে। কোন পশুকে জবাই করার সময়ও “বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার” বলে জবাই করে। তাকবীর ধ্বনি বর্তমান

বিশ্বে মুসলমানদের সর্বাধিক স্পষ্ট ও পার্থক্যসূচক প্রতীক। কারণ, ইসলামের মহানবী ﷺ আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমেই কাজ শুরু করেছিলেন।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এ সময়ই প্রথমবারের মত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবুওয়াতের বিরাট গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তৎপর হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ আয়াতগুলোর "শানে নুযুল" থেকেই সে বিষয়টি জানা গিয়েছে। একথা তো স্পষ্ট যে, যে শহর, সমাজ ও পরিবেশে তাঁকে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার জন্য তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল তা ছিল শিরকের কেন্দ্রভূমি বা লীলাক্ষেত্র। সাধারণ আরবদের মত সেখানকার অধিবাসীরা যে কেবল মুশরিক ছিল, তা নয়। বরং মক্কা সে সময় গোটা আরবের মুশরিকদের সবচেয়ে বড় তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। আর কুরাইশরা ছিল তার ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী, সেবায়ত ও পুরোহিত। এমন একটি জায়গায় কোন ব্যক্তির পক্ষে শিরকের বিরুদ্ধে এককভাবে তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করা জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করার শামিল। তাই "ওঠো এবং সাবধান করে দাও" বলার পরপরই "তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো" বলার অর্থই হলো যেসব বড় বড় সন্ত্রাসী শক্তি তোমার এ কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে হয় তাদের মোটেই পরোয়া করো না। বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, যারা আমার এ আহবান ও আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আমার "রব" তাদের সবার চেয়ে অনেক বড়। আল্লাহর দ্বীনের কাজ করতে উদ্যত কোন ব্যক্তির হিম্মত বৃদ্ধি ও সাহস যোগানোর জন্য এর চাইতে বড় পন্থা বা উপায় আর কি হতে পারে? আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের নকশা যে ব্যক্তির হৃদয়-মনে খোদিত সে আল্লাহর জন্য একাই গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অনুভব করবে না।

অর্থাৎ একমাত্র তোমার প্রতিপালকের বড়ত্ব বর্ণনা কর। বস্তুত এ বিশ্ব জগতে যত প্রাণী, বস্তু ও সৃষ্টি আছে তার সবই ছোট ও নগণ্য। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বড়, শ্রেষ্ঠ ও মহান। সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম আল্লাহ তা'আলার সামনে সকল সত্তা, শক্তি ও বস্তু ইত্যাদি অদৃশ্য ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ ঈমানী আকীদাহ-বিশ্বাস, প্রত্যয় ও চেতনা নিয়ে মানবজাতিকে সতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুরা: আল-মুদ্দাস্সির

আয়াত নং :-4

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

তোমার পোশাক পবিত্র রাখো,৪

তাফসীর :

এ আয়াতের দুটি তাফসীর হতে পারে :

(১) এর দ্বারা উদ্দেশ্য আমলকে সকল প্রকার রিয়া, খারাবী, নিফাকী ও অহংকার ইত্যাদি থেকে সংশোধন ও পবিত্র করা। এতে কাপড়ের পবিত্রতাও শামিল। কেননা কাপড়কে পবিত্র রাখা আমলকে পবিত্র রাখার পরিপূর্ণতা, বিশেষ করে সালাতে। এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত।

(২) কাপড় পবিত্র রাখা। অর্থাৎ সকল প্রকার নাজাসাত থেকে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে। (তাফসীর সা'দী)

এটি একটি ব্যাপক অর্থ ব্যঞ্জক কথা। এর অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত। এর একটি অর্থ হলো, তুমি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ নাপাক বস্তু থেকে পবিত্র রাখো। কারণ শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা এবং "রূহ" বা আত্মার পবিত্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন পবিত্র আত্মা ময়লা-নোংরা ও পূতিগন্ধময় দেহ এবং অপবিত্র পোশাকের মধ্যে মোটেই অবস্থান করতে পারে না। রসূলুল্লাহ ﷺ যে সমাজে ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন তা শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক আবিলতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল না বরং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে পর্যন্ত সে সমাজের লোক অজ্ঞ ছিল। এসব লোককে সব রকমের পবিত্রতা শিক্ষা দেয়া ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ। তাই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর বাহ্যিক জীবনেও পবিত্রতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখেন। এ নির্দেশের ফল স্বরূপ নবী (সা.) মানবজাতিকে শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা সম্পর্কে এমন বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন যে, জাহেলী যুগের আরবরা তো দূরের কথা আধুনিক যুগের চরম সভ্য জাতিসমূহও সে সৌভাগ্যের অধিকারী নয়। এমনকি দুনিয়ার অধিকাংশ ভাষাতে এমন কোন শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায় না যা "তাহারাত" বা পবিত্রতার সমার্থক হতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামের অবস্থা হলো, হাদীস এবং ফিকাহর গ্রন্থসমূহে ইসলামী হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান সম্পর্কে সব আলোচনা শুরু হয়েছে "কিতাবুল তাহারাত" বা পবিত্রতা নামে অধ্যায় দিয়ে। এতে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার পার্থক্য এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় ও পন্থাসমূহ একান্ত খুঁটিনাটি বিষয়সহ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

একথাটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। বৈরাগ্যবাদী ধ্যান-ধারণা পৃথিবীতে ধর্মাচরণের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছিল তাহলো, যে মানুষে যাতো বেশী নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন হবে সে ততো বেশী পূত-পবিত্র। কেউ কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরলেই মনে করা হতো, সে একজন দুনিয়াদার মানুষ। অথচ মানুষের প্রবৃত্তি নোংরা ও ময়লা জিনিসকে অপছন্দ করে। তাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর বাহ্যিক অবস্থাও এতোটা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন যেন মানুষ তাকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার ব্যক্তিত্বে এমন কোন দোষ-ত্রুটি যেন না থাকে যার কারণে রুচি ও প্রবৃত্তিতে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

একথাটির তৃতীয় অর্থ হলো, নিজের পোশাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র রাখো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তো অবশ্যই থাকবে তবে তাতেও কোন প্রকার গর্ব-অহংকার, প্রদর্শনী বা লোক দেখানোর মনোবৃত্তি, ঠাটবাট এবং জৌলুসের নামগন্ধ পর্যন্ত থাকা উচিত নয়। পোশাক এমন একটি প্রাথমিক জিনিস যা অন্যদের কাছে একজন মানুষের পরিচয় তুলে ধরে। কোন ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করে তা দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই মানুষ বুঝতে পারে যে, সে কেমন স্বভাব চরিত্রের লোক। নওয়াব, বাদশাহ ও নেতৃ পর্যায়ের লোকদের পোশাক, ধর্মীয় পেশার লোকদের পোশাক, দাম্ভিক ও আত্মম্ভরী লোকদের পোশাক, বাজে ও নীচ স্বভাব লোকদের পোশাক এবং গুণ্ডা-পাণ্ডা ও বখাটে লোকদের পোশাকের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। এসব পোশাকই পোশাক পরিধানকারীর মেজাজ ও মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করে। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর মেজাজ ও মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই এসব লোকদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। তাই তার পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে স্বতন্ত্র ধরনের হওয়া উচিত। তাঁর উচিত এমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা যা দেখে প্রত্যেকেই অনুভব করবে যে, তিনি একজন শরীফ ও ভদ্র মানুষ, যাঁর মন-মানস কোন প্রকার দোষে দুষ্ট নয়।

এর চতুর্থ অর্থ হলো, নিজেকে পবিত্র রাখো। অন্য কথায় এর অর্থ হলো, নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র থাকা এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। ইবনে আব্বাস, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, আতা, মুজাহিদ, কাতাদা, সা'ঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বাসরী এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাসসিরের মতে এটিই এ আয়াতের অর্থ। অর্থাৎ নিজের নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখো এবং সব রকমের দোষ-ত্রুটি থেকে দূরে থাকো। প্রচলিত আরবী প্রবাদ অনুসারে যদি বলা হয় যে, فلان طاهر الثياب وفلان طاهر الذيل (অমুক ব্যক্তির কাপড় বা পোশাক পবিত্র অথবা অমুক ব্যক্তি পবিত্র।" তাহলে এর দ্বারা বুঝানো হয় যে, সে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র খুবই ভাল। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় فلان دنس الثياب (অমুক ব্যক্তির পোশাক নোংরা তাহলে এ দ্বারা বুঝানো হয় যে, লোকটি লেনদেন ও আচার-আচরণের দিক দিয়ে ভাল নয়। তার কথা ও প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখা যায় না)।

সুরা: আল-মুদ্দাস্সির

আয়াত নং :-5

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ

অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো,৫

তাফসীর :

টিকা:৫) অপবিত্রতার অর্থ সব ধরনের অপবিত্রতা। তা আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অপবিত্রতা হতে পারে, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্মের অপবিত্রতা হতে পারে আবার শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং উঠা বসা চলাফেরার অপবিত্রতাও হতে পারে। অর্থাৎ তোমার চারদিকে গোটা সমাজে হরেক রকমের যে অপবিত্রতা ও নোংরামী ছড়িয়ে আছে তার সবগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। কেউ যেন তোমাকে একথা বলার সামান্য সুযোগও না পায় যে, তুমি মানুষকে যেসব মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করছো তোমার নিজের জীবনেই সে মন্দের প্রতিফলন আছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : الرُّجْزَ হল মূর্তি, প্রতিমা। আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করা হয়। যহহাক (রহঃ) বলেন : আয়াতের অর্থ হল : অবাধ্য কাজ ছেড়ে দাও। (ইবনু কাসীর)

আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেন : الرُّجْزَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল সকল খারাপ কাজ ও কথা। তাই বলা যায়, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ছোট-বড়, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার পাপ কাজ বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশে শির্কও শামিল। মূলত এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে উম্মাতের সকলকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

সুরা: আল-মুদ্দাস্সির

আয়াত নং :-6

وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

বেশী লাভ করার জন্য ইহসান করো না৬

তাফসীর :

টিকা:৬) মূল বাক্যাংশ হলো وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ একথাটির অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র কথায় অনুবাদ করে এর বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব নয়।

এর একটি অর্থ হলো, তুমি যার প্রতিই এহসান বা অনুগ্রহ করবে, নিস্বার্থভাবে করবে। তোমার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং দানশীলতা ও উত্তম আচরণ হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। ইহসান বা মহানুভবতার বিনিময়ে

কোন প্রকার প্রার্থিব স্বার্থ লাভের বিন্দুমাত্র আকাংখাও তোমার থাকবে না। অন্য কথায় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইহসান করো, কোন প্রকার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইহসান করো না।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, নবুওয়াতের যে দায়িত্ব তুমি পালন করছো। যদিও তা একটি বড় রকমের ইহসান, কারণ তোমার মাধ্যমেই আল্লাহর গোটা সৃষ্টি হিদায়াত লাভ করছে। তবুও এ কাজ করে তুমি মানুষের বিরাট উপকার করছো এমন কথা বলবে না এবং এর বিনিময়ে কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করবে না।

তৃতীয় অর্থ হলো, তুমি যদিও অনেক বড় ও মহান একটি কাজ করে চলেছো কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজের কাজকে বড় বলে কখনো মনে করবে না এবং কোন সময় চিন্তাও যেন তোমার মনে উদিত না হয় যে, নবুওয়াতের এ দায়িত্ব পালন করে আর এ কাজে প্রাণপণ7 চেষ্টা-সাধনা করে তুমি তোমার রবের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছো।

সুরা: আল-মুদ্দাস্সির

আয়াত নং :-7

وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

এবং তোমার রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।৭

তাফসীর :

অর্থাৎ যে কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ কাজ করতে গিয়ে তোমাকে কঠিন বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে। তোমার নিজের কওম তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। সমগ্র আরব তোমার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লাগবে। তবে এ পথে চলতে গিয়ে যে কোন বিপদ-মুসিবতই আসুক না কেন তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সেসব বিপদের মুখে ধৈর্য অবলম্বন করো এবং অত্যন্ত অটল ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকো। এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, বন্ধুত্ব-শত্রুতা এবং ভালবাসা সব কিছুই তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এসবের মোকাবেলা করতে গিয়ে নিজের অবস্থানে স্থির ও অটল থাকবে।

এগুলো ছিল একেবারে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে যে সময় নবুওয়াতের কাজ শুরু করতে আদেশ দিয়েছিলেন সে সময় এ দিকনির্দেশনাগুলো তাঁকে দিয়েছিলেন। কেউ যদি এসব ছোট ছোট

বাক্য এবং তার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে স্বতস্ফূর্তভাবে তার মন বলে উঠবে যে একজন নবীর নবুওয়াতের কাজ শুরু করার প্রাক্কালে তাঁকে এর চাইতে উত্তম আর কোন দিকনির্দেশনা দেয়া যেতে পারে না। এ নির্দেশনায় তাঁকে কি কাজ করতে হবে একদিকে যেমন তা বলে দেয়া হয়েছে তেমনি এ কাজ করতে গেলে তাঁর জীবন, নৈতিক চরিত্র এবং আচার-আচরণ কেমন হবে তাও তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এর সাথে সাথে তাঁকে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, তাকে কি নিয়ত, কি ধরনের মানসিকতা এবং কিরূপ চিন্তাধারা নিয়ে একাজ আঞ্জাম দিতে হবে আর এতে এ বিষয়েও তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, একাজ করার ক্ষেত্রে কিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং তা মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে। বর্তমানেও যারা বিদ্বেষের কারণে স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে বলে যে, (নাউযুবিল্লাহ) মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার মুহূর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এমন কথা উচ্চারিত হতো, তারা একটু চোখ খুলে এ বাক্যগুলো দেখুক এবং নিজেরাই চিন্তা করুক যে, এগুলো কোন মৃগী রোগে আক্রান্ত মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত কথা না কি মহান আল্লাহর বাণী যা রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি তার বান্দাকে দিচ্ছেন?

'সবার' শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেয়া ও অনুবর্তী করা। এখানে কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। দুই. সৎকাজ করা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। তিন. বিপদাপদে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। [মাদারেজুস সালেকীন ২/১৫৬] সুতরাং সৎকর্ম সম্পাদন, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং এতদসংক্রান্ত বিপদাপদ মোকাবেলা করা সবই 'সবর' এর শামিল। সুতরাং আয়াতের অর্থ হচ্ছে, হকের নসিহত করার সাথে সাথে দ্বিতীয় যে জিনিসটি ঈমানদারগণকে ও তাদের সমাজকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবে তা হচ্ছে এই যে, এই সমাজের ব্যক্তিবর্গ পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। হককে সমর্থন করতে ও তার অনুসারী হতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এ পথে যেসব কষ্ট, পরিশ্রম, বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও বঞ্চনা মানুষকে নিরন্তর পীড়িত করে তার মোকাবেলায় তারা পরস্পর অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে এসব কিছু বরদাশত করার জন্য তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে সাহস যোগাতে থাকবে। [ড. কারী, তাফসীর সূরাতিল আসর পৃ. ৬২-৬৩]

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রত্যেক অনুসারীর ওপর আবশ্যক মানুষকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা।

২. একজন মু'মিন তার সকল প্রকার কাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করবে।

৩. শির্ক এক প্রকার অপবিত্রতা, তা থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক।